কোভিড ১৯-এর পর বাজার ও অর্থনীতি: কিছু প্রশ্ন, কিছু উত্তর

মলয় লাহিড়ী

ঠিকঠিকানা
কলকাতা

বইয়ের কথা

মলয় লাহিড়ী, এই ছোট্ট বইটির লেখক, আমার তরুণ বন্ধু, প্রতিবেশী, দেখা হলেই কথাবার্তা হয়। একথা, সেকথার পরেই 'বাজার' নিয়ে কথা চলে আসে।

মলয় অনেককাল ধরে 'বাজার সমীক্ষা'র কাজে রয়েছে। বলতে গেলে এখন এই সমীক্ষায় বিশেষজ্ঞ। বাজারের হালচাল, এখনকার, কয়েকদিন পরের, ওর নজরে এবং মাথায়।

এখন এই অসুখ 'কোভিড-১৯' শুধুই আমাদের শরীর নিয়ে চিন্তায় ফেলেনি, অর্থনীতি নিয়েও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

কাজ কমে যাচ্ছে, চাকরি চলে যাচ্ছে, আয়ে টান ধরেছে, খরচ করতে হিমসিম, জমানো টাকায় হাত পড়ছে, ক্রেতারা নাজেহাল।

লোকের হাতে টাকা কমছে, বাজারে লোক কম আসছে, জিনিস কম কিনছে, বিক্রেতাদের মাথায় হাত,বিক্রি না হলে বিক্রেতাদের রোজগার নেই।

কাজ নেই তাই আয় নেই, আয় নেই তাই বিক্রি নেই, বিক্রি নেই তাই আয় নেই।

এর আবার একধাপ পিছনের দিক আছে। বিক্রি নেই তাই বানানো নেই, বানানো নেই তাই বানানোর লোক দরকার নেই, শ্রমিক কর্মচারীদের দরকার নেই। আবার ঘুরে ফিরে আয় কমার গপ্পো। যেখান থেকে কথা শুরু, সেইখানেই ফিরে যাওয়া।

এই সব বিষয়গুলো হাতে নাতে চোখের সামনে দেখা যায় বাজার-এ। 'বাজার সমীক্ষা' সেই কথাগুলো ধরতে পারে, বুঝতে পারে। তাই বাজার সমীক্ষায় বহুদিন থাকা মলয়কে ধরা। বুঝিয়ে বলো।

কয়েকটি যতটা পারা সোজাসাপটা প্রশ্ন বানিয়ে দিয়েছি, মলয় যতটা পারা যায় সহজ সরলে উত্তর সাজিয়ে দিয়েছে। অল্প কথায় সার কথাটা।

মলয় যেখানে যেখানে সুযোগ পেয়েছে অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথা বলে দিয়েছে। তাই তো হবার কথা। রাজনীতি ঠিক করে দেয় অর্থনীতি কেমন হবে।

মলয় চেয়েছে, আমরা যারা এই ছোট্ট বইটা বের করছি তারাও চাইছি যারা পড়লেন তারা অর্থনীতির বাজার, বেচা, কেনা, কাজ, আয়, এসবের সাথে রাজনীতিটাও বুঝে নিন।

কলকাতা
১ আগস্ট ২০২০

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

১। বাজারে জিনিস বেচাকেনা, যারা কিনছে, যারা বিক্রি করছে তাদের ওপর এখন এই সময়ে কি কোনও সমীক্ষা করা হয়েছে? হলে কি কি বিষয়ে?

যখন সবকিছু স্বাভাবিক ছিল তখন নানান পণ্য এবং পরিষেবার উপর ক্রেতাদের মতামতের ওপর সমীক্ষা হত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণ্যের বাজারে আসার আগে তার নানারকম পরীক্ষামূলক সমীক্ষা হয়, স্বাদ গন্ধেরও হতে পারে কিংবা কেমন মোড়কে পণ্যটি আছে তারও সমীক্ষা হয়। কিন্তু যখন থেকে লকডাউন শুরু হল তখন মূলত দুটো কারণে বাজার সমীক্ষা সাময়িকভাবে বন্ধ হল :

ক) আমাদের মত বিরাট দেশে তেল, নুন, সাবান, টুথপেস্ট, সিগারেট, চা সবকিছুর সমীক্ষাই সরাসরি কথা বলা-শোনার উপর নির্ভরশীল। সেখানে ক্রেতার মতামত পাওয়া ১) তুলনামূলক সহজ, ২) এক্ষেত্রে যার মতামত নিতে চাইছেন তারটাই পাবেন। কিন্তু অনলাইন সমীক্ষার ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চিত নন কে উত্তর ভরে দিল। ধরুন মায়ের রান্নার তেলের উপর মতামত দরকার। মা ভালো জানেন না 'লিঙ্ক' এ কি করে মতামত দিতে হয়, মেয়ে হয়ত মায়ের জায়গায় মত দিলেন, তার মানে মেয়ের মতামত মায়ের মতামত হয়ে উঠল।

খ) উৎপাদক এই পরিস্থিতিতে আগে দেখবে তার জিনিস বিক্রি হচ্ছে কিনা, তারপর তো সে বিচার করবে পণ্য পরিষেবার পরিবর্ধন মতামতের মাধ্যমে। এখন খরচ কমানোর পন্থা হিসাবে উৎপাদক সমীক্ষা করানো সাময়িক বন্ধ রাখাই শ্রেয় বলে মনে করছে। কাজেই ক্রেতা-বিক্রেতার উপর কোনও সমীক্ষা এখন জোরকদমে কিছু হচ্ছে না।

২। এর প্রভাব এই কাজে যারা যুক্ত তাদের ওপর কিভাবে পড়ছে?

এই বাজার সমীক্ষার কাজের উপর নির্ভর করেন অনেক পরিবার (যারা সমীক্ষক) যেটা তাদের রুটি-রুজি। মাথায় রাখতে হবে এরা কিন্তু দিন আনেন দিন খান। তারা কাজ হারালেন বড় সংখ্যায়। এই পরিস্থিতিতে তারা অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিতে। অন্যদিকে যেটুকু কাজ করা যাচ্ছে তা থেকে যা উঠে আসছে,তা হল গ্রামে কারোর একটি ছোট্ট মিষ্টির দোকান ছিল সেটাই তার সম্বল, সেই কাজ ২ মাসের উপর বন্ধ ছিল, কাজেই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে পুরনো সামান্য জমানো পুঁজির ওপর, নতুবা কারোর থেকে ধার নিয়ে চালাতে হয়েছে-পরিবার, সন্তান, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য। এরকম হয়েছে যে মা নিজের স্যানিট্যারি ন্যাপকিন না কিনে ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করছেন যাতে সেই টাকা থেকে সন্তানের জন্য দুধ কিনতে পারেন। কাজেই অর্থনীতির অবস্থা সামগ্রিকভাবে কি তা সহজেই অনুমেয়।

৩। বাজারে কোন কোন পণ্যের বিক্রির পরিমাণ কমে গেছে, যাচ্ছে? কেন?

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা কমেছে বলে মনে হয় না। বিলাসবহুল দ্রব্যের চাহিদা কমছে। দিন কয়েক আগে খবরে প্রকাশ পেয়েছে রাজ্যের অন্যতম মূল রোজগারের জায়গা - মদ তার বিক্রি অনেক কমে গেছে। তার মানে মানুষের হাতে টাকার যোগান যেটুকু আছে সেটি তার প্রতিদিনের ব্যবহারিক চাহিদা মেটাতেই চলে যাচ্ছে। যার ফলে একটুখানি বিলাসবহুল বা বলা যেতে পারে যেটা না হলেও আমার চলে যায় সেই ধরনের ব্যয়ের ক্ষেত্র কমছে। যেমন সন্ধেবেলা আমার ৪০টাকা দামের একটি রোল না খেলেও চলে যাচ্ছে, সপ্তাহে বা ১০ দিনে চারজনের সংসারে একবার হয়ত ৬০০-৭০০ টাকা খরচা করে বিরিয়ানি খাওয়া হত। গত কয়েকমাসে সেই পরিমাণ অনেক কম বা পড়তির দিকে। ফলে এর সাথে জড়িত মানুষের আয় কমছে। যার সরাসরি প্রভাব সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার উপর পড়ছে।

৪। বাজারে কি কি ধরনের পণ্যের বিক্রির পরিমাণ বেড়ে গেছে? কেন?

কোভিডের ফলে কিছু পণ্য নতুন করে জন্ম নিয়েছে - মাস্ক, স্যানিটাইজার, গ্লাভস্, ফেস শিল্ড ইত্যাদি। রোগের বিরুদ্ধে লড়াইতে নতুন হাতিয়ার। নতুন করে যা অনেকখানি চাহিদা তৈরি করছে। তাতে হয়ত কিছু মানুষের রুটি-রুজি নতুন করে বাঁচতে পারে, যদি ছোট মাপের উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের এখন মল

থেকে মাস্ক না কিনলে তো আবার হয় না। কাজেই মহামারীর ফলে এই নতুন পণ্যের এক অর্থনীতি চালু হয়েছে। অনেক স্বনির্ভরগোষ্ঠী এর মাধ্যমে কাজ পাচ্ছেন।

৫। কোন ধরনের (আয়ের) ক্রেতার পরিমাণ কমে গেছে?

লকডাউনের নাম করে প্রচুর ছাঁটাই হচ্ছে, মূলত বেসরকারি সংস্থায়, তা সে বিমান হোক, ভ্রমণ হোক, হোটেল ব্যবসা হোক যাই হোক না কেন। ফলত আমার মনে হয় মধ্যমবর্গের মানুষেরা এই কোভিড অর্থনীতির শিকার। আমি মাসে ৪০,০০০ হাজার টাকা রোজগার করতাম। কাল সকালে শুনলাম চাকরি নেই। আমার তো আর খরচ কমল না। আমি এতদিন ধরে যা যা করে আসছিলাম সব কি বাদ দিয়ে দিতে পারব। আজ নিম্নবিত্তের জন্য ভুল/ঠিক কোন একটা পথে তার পেট ভরানোর জন্য সরকার সদাব্যস্ত থাকে, কিছু একটা পাইয়ে দিয়ে, তার উন্নতি সাধন করে নয়। তার উন্নতি হয়ে গেলে তো সে আর সেই অর্থে ভোটার থাকল না। মধ্যবিত্ত মানুষ সংসারটা চালায় তার কাজের উপর ভরসা করে। সে মাঝে মাঝে রেগে যায়, আফসোস করে, কিন্তু না পাওয়ার যন্ত্রনাটা প্রকাশ করতে পারে না। তার বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে একা একা দৌড়ে বেড়ায়। কাজেই মধ্যবিত্তের রোজগার/সঞ্চয়ের ঘাটতি তাকে বাজার বিমুখ করে তুলছে। তার প্রভাব আজকে ফলওয়ালা, সব্জিওয়ালা, মাছওয়ালাকেও ধাক্কা দিচ্ছে। এই বড় অংশের মধ্যবিত্ত আলোচনার আঙ্গিনা থেকে বরাবরই ব্রাত্য থেকেছে। আজও আছে।

৬। কোন ধরনের (আয়ের) ক্রেতার পরিমাণ বেড়ে গেছে?

যারা ছিলেন উচ্চবিত্তের মানুষ তারাই আছে। আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে যারা সরকারী কাজ করে তারা তুলনামূলকভাবে ভালো জায়গায় আছে। চাকরি চলে যাবে এই দুশ্চিন্তা তাদের বহন করতে হয় না। বেসরকারি সংস্থায় সবসময়ই মুনাফা একটা বড় প্রাধান্য পায়, শোষণ থাকে এটা ধ্রুব সত্য।যেটা অনুচ্চারিত থাকে তা হল অনিশ্চয়তা। ফলে এমনিতেই মানুষেরা বেঁচে মরে থাকেন। এই অংশটি বাদ দিয়ে যাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়নি তাদের রসদ ফুরোনোর রাস্তা কম, তারাই বেশি পরিমানে বাজারকে সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৭। যেসব জিনিসের বেচাকেনা কমে গেছে, তার প্রভাব তো সেই সেই জিনিসের উৎপাদনের উপর পড়বে এবং তার ফলে তো শ্রমিক/কর্মী নিয়োগ কমে যাবে তাই তো? এই প্রক্রিয়াটা কি শুরু হয়ে গেছে?

খুবই স্বাভাবিক সেটা। এবং তার প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় আমাদের অর্থনীতির একটা বড় অংশ এখন পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। যেমন ছোট ক্যুরিয়্যর কোম্পানি, ছোট এজেন্সি নিয়ে কাজ চালানো মানুষ, ছোট খাবারের দোকান, খই, মুড়ি, চানাচুর এর দোকান, এরা বিরাটভাবে বন্ধের সম্মুখীন। চারদিকে এক অদ্ভুত নীরবতা। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের পারস্পারিক আঁকচাআঁকচি, দিশাহীন সরকারী নীতি আমাদেরকে এতটাই দূরে ঠেলে দিচ্ছে, যা

কিনা অচিরে একটা অসীম খিদে এবং না পাওয়ার যন্ত্রনাকে সামনে টেনে নিয়ে আসবে। ফলত খুব স্বাভাবিক নিয়মে বেচাকেনা কমছে এবং তার ফলে সেই অনুষঙ্গে যা যা জড়িত সবকিছুরই চাহিদা কমে যাচ্ছে।

৮। তাহলে কি ভারতের অর্থনীতি এমন একটা অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে - কম কেনা - কম উৎপাদন - কম শ্রমিক কর্মী নিয়োগ - কম আয় - কম কেনা - এই বৃত্তে পৌঁছে যাচ্ছে? বাজার দেখে কি এই ধারনায় আসা যাবে?

একদম সঠিক কথা। এই যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তাতে কেউ কিছু জানে না কি করা উচিত। সবাই সাময়িক পরিত্রাণ চাইছে। যখন আমাদের দেশে লক-ডাউন শুরু হল তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেছিলেন যেন কেউ কাজ না হারায়। কিন্তু বাস্তবে অন্য চিত্র। এখন কর্মহীনতা থেকে বাঁচতে লোকে সঞ্চয়ে হাত দিচ্ছে। দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপরও একটা পরোক্ষ চাপ তৈরি হচ্ছে যাতে কিনা 'ঋণ শোধ না করা' আবার ঋণ বেড়ে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

৯। বাজারে যেসব পণ্য এখন বেচাকেনা হচ্ছে, তার কতটা আমদানি করা বিদেশি পণ্য, আর কতটা দেশে বানানো?

বর্তমান ভারতীয় বাজারে যে ভোগ্যদ্রব্য কেনা বেচা হচ্ছে, তার কতটা বিদেশ থেকে আমদানি, এর তেমন পরিসংখ্যান নেই। মনে রাখতে হবে যে, সরাসরি বিদেশে তৈরি জিনিস ভারতে আমদানি

মারফত এসে ক্রেতার ক্রয় তালিকায় চলে এলো, এরকম আজকাল কমই হয়। উপকরণ বিদেশ থেকে আসে, দেশে সে সব উপকরণ একত্রিত করে বা প্যাকেজিং করে, দেশীয় বলে, বাজারে বিক্রি হয়। সুতরাং ভারতে বিক্রয়সামগ্রীর মধ্যে বিদেশী জিনিস কত, তার একটা ধারনা দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে আমদানির পরিমাণ কত শতাংশ, তার থেকে পাওয়া যায়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে এই পরিমাণ বেড়ে চলেছে। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে এটা ছিল ৫-৬%, নয়ের দশকে সেটা ১০% ছাড়াল আর এখন ২৫% এর উপরে।

১০। বাজারে যে সব পণ্য বানানো হচ্ছে তার কতটা বড়ো উৎপাদন সংস্থাদের বানানো পণ্য, আর কতটা মাঝারি ও ছোটো উৎপাদকের পণ্য?

এখানেও একই সমস্যা। আজকাল আলাদা করে, ছোট সংস্থার উৎপাদন বা বড় সংস্থার উৎপাদন বলে কোন পণ্যকে চিহ্নিত করা মুশকিল। যদি গাড়ি শিল্পকে ধরি, তাহলে আমরা ভাববো এটি একটি বড় শিল্পের উদাহরণ। কিন্তু বাস্তবে এর বড় অংশই তৈরি হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। আমরা হয়ত টেলিকম পরিষেবা প্রদানের জন্য এয়ারটেলকে দেখছি। কিন্তু বাস্তবে এয়ারটেল একটি বিল ও বিপণন করার সংস্থা-মূল পরিষেবা দিচ্ছে ছোট ছোট সব সংস্থা, যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের কম মজুরির সাহায্যে এয়ারটেলের মত সংস্থাকে পোষণ করছে। রিলায়েন্স কমিউনিকেশনের মত সংস্থা

লালবাতি জ্বালালে এরাই বিপদে পড়ে। রিলায়েন্স জিও মার্ট-এর যে খুচরো ব্যবসার ধরন, তাও এই বড় সংস্থার সঙ্গে ছোট বিক্রেতারদের জুড়ে নেওয়ার কাঠামো।

১১। উৎপাদনের, বাজারের, বিক্রেতাদের, ক্রেতাদের এই অবস্থার জন্য বর্তমান সরকারি বিধিনিষেধ, লক ডাউন, বাজার বন্ধ রাখা, ক্রেতাদের আটকে রাখা, বাজারে না আসতে দেওয়া, এই সমস্তকে কতটা দায়ি করা যায়?

বিষয়টা দায়ি করার নয়। প্রশ্নটা আপনি আপনার চিন্তার স্তর থেকে কতখানি দূরের জিনিস দেখতে পারছেন। যারা নীতি নির্ধারণ করছে তারা বইয়ের বাইরে কিছুতেই যাবেন না। যেমন কারোর ক্যান্সার হল। চিকিৎসক জানেন এই মানুষটিকে যদি আমি খুব চেষ্টা করি তাহলে ৮ মাস বাঁচবে, কিন্তু সেই ৮ মাসের মধ্যে ৬ মাসই খুব খারাপভাবে বাঁচবে। আর যদি চিকিৎসা না করে শুধু মাত্র সহায়তা ব্যবস্থায় দিয়ে রাখি তাহলে হয়ত ৬ মাস বাঁচবে কিন্তু তার মধ্যে ৫.৫ মাসই ভালোভাবে বাঁচবে। এই যে দূরদর্শিতা এটা সবার থাকে না। তেমনই নিজের পিঠে যাতে কোনও আঁচড় না লাগে সেই ভেবে সরকার এবং তার সহযোদ্ধারা লড়ছে একটা আতঙ্ক নিয়ে। লকডাউন করে কি কিছু লাভ হল? ২.৫ মাস লকডাউন হল খেলার ছলে। তাতে রোগ,রোগী আতঙ্ক কিছুই কমল না। মানুষ কাজ হারালো। বাজারগুলো ক্ষতির মুখে। শহরের বাবা-মা'রা রাস্তায় নেমেছেন ছেলে মেয়েদের স্কুলে ফি দিতে পারছেন না। ভাবুন তো, একটা

রোগের মারা যাওয়ার হার চার শতাংশ, তাকে আটকাতে গিয়ে আজ কত মানুষের এর থেকে কত বড় বড় ক্ষতি হয়ে গেল। একটা মধ্য চল্লিশের লোকের চাকরি গেলে সে কি পারবে কাল থেকে রাস্তায় আলু নিয়ে বসতে? পারবে না। 'সামাজিক দুরত্ব' মানে তো আর ঘৃণা নয়। আসলে তাই তো হচ্ছে। ছাপ মেরে দেওয়া আর অন্ধকারময়তা আমাদেরকে আজ এক সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছে।

১২। এই যে বাজার না বসা এবং ক্রেতাদের বাজারে না আসা তার ফলে অনলাইন কেনাবেচা বেড়েছে? যদি বেড়ে থাকে, তাহলে কি বলা যাবে যতটুকু বাজার আছে তাতে বড়ো বিক্রেতারা ছোটো বিক্রেতাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে?

বাজার সারা দেশ জুড়ে। আমাদের দেশের কতটুকু মানুষের কাছে ইন্টারনেট সংযোগ আছে? তারপর তো তারা অনলাইনে কেনাকাটা করবেন। এটা অনেকটাই সীমাবদ্ধ শহরের একটা অংশের মানুষের কাছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিংবা শহরের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে তেমনভাবে অনলাইন সাড়া ফেলতে পারেনি। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে শহরের মানুষ অনলাইনে কেনাকাটা বেশি করাতে বড় ব্যবসাদারের কিছু সুবিধা হয়েছে। ছোট বিক্রেতাদের সরিয়ে দেওয়া আমাদের মত এতবড় দেশে সম্ভব নয়। বরং শপিং মলের বড় মনোহারি দোকান থেকে কেনার অভ্যেস 'শঙ্কর মুদি'র কাছে অনেক বড় ভয়ের বিষয়।

১৩। বাজার, পণ্য উৎপাদনের ঘর বাহির, বেচা কেনা, বিক্রেতা, তাদের ছোট বড় নানান ভাগ। এই সবের অবস্থা দেখে ভারতের অর্থনীতির এখনকার ও ভবিষ্যতের চেহারা নিয়ে কি কি বলা যেতে পারে?

এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। তবে অর্থনীতিতে যে প্রবণতা গত কয়েক বছর ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে এটুকু বলা যায়, যে, অর্থনীতির নীচের স্তরে অনেক চাপ বাড়বে। ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। এই প্রবণতা আরও বাড়বে। বিশ্বজুড়ে নগদ বাড়ানোর অর্থনৈতিক নীতি শেয়ার, সোনা, বিলাসবহুল গৃহ ইত্যাদি সম্পদের দাম বাড়াচ্ছে এবং বড়লোককে আরও বড়লোক করছে। বড়লোকেদের থেকে করের আর সরকারের ছাপানো টাকার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নীচের স্তরের মানুষদের কিছু সাহায্য দেওয়া এবং এইভাবে অর্থনীতিকে কোনওরকমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা এখন চলছে, তাও আর না এগোনর দিকে। আগামীদিন এই অর্থনৈতিক অসাম্য কী রাজনীতি নিয়ে আসে, সেটি এই মুহূর্তের বড় জিজ্ঞাসা।